ইসলামী শরীয়তের মৌলিক নীতিমালা

أصول الشريعة الإسلامية

সঙ্কলনে
আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী

আলোকিত প্রকাশনী

ইসলামী শরীয়তের মৌলিক নীতিমালা

أُصُولُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ

গ্রন্থস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০২১।

মুদ্রিত মূল্য: ১৬৫ (একশত পঁয়ষট্টি) টাকা।

অনলাইন পরিবেশক: আলোকিত বই বিতান, রকমারি, ওয়াফি লাইফ, SalafiBooksbd.com, ikhlasstore.com

পৃষ্ঠাসজ্জা ও প্রচ্ছদ: হাবিব বিন তোফাজ্জল।

সূচিপত্র

⊙ প্রকাশকের কথা ৫

⊙ অবতরণিকা ৬

⊙ দলীল ৭

⊙ ইজমা ১৬

⊙ কিয়াস ১৯

⊙ রসুল (সা.)-এর কর্মাবলি ২৪

⊙ সাহাবীর উক্তি ৩১

⊙ নাসেখ-মনসূখ ৩৩

⊙ পরস্পরবিরোধী দলীলের মাঝে সমন্বয় সাধনের নীতিমালা . . ৩৫

⊙ শরয়ী শব্দার্থ বুঝা অপরিহার্য ৩৮

⊙ শরীয়তের হুকুম, আদেশ-নির্দেশসূচক বাক্য ৪০

⊙ নিষেধ ৫০

⊙ আম-খাস ৫৩

⊙ ভাবার্থ ৬৩

⊙ শরয়ী বিধানসমুহের পাঁচটি মান ৬৬

⊙ ওয়াজেব ৬৭

⊙ মুস্তাহাব, মানদূব বা সুন্নত ৭৩

- মুবাহ ৭৫
- মাকরূহ ৭৭
- হারাম ৭৯
- মুসলিম নর-নারীর ক্ষেত্রে কতিপয় মৌলনীতি ৮২
- ইজতিহাদ ও তাক্বলীদ ৮৫
- বিবিধ ফিকহী নীতিমালা ৯৪
- বিদআতের নীতিমালা ১১৪
- যে প্রক্রিয়াতে হাদীসকে সহীহ-যয়ীফ নির্ধারণ সঠিক নয় . . ১২২

ইজমা

ইজমা’ শরীয়তের অন্যতম দলীল। এর অর্থ হল, সর্ববাদীসম্মতি। তার মানে কোন এক বিষয়ে সকল পক্ষের একমত হওয়া এবং কোন পক্ষের দ্বিমত বা বিরোধিতা না থাকা।

শরীয়তের পরিভাষায়ঃ কোনও বিষয়ে নবী (ﷺ)-এর ইন্তিকালের পর কোনও যুগে তার উম্মতের সকল মুজতাহিদগণের একমত হওয়া।

এ বিষয়েও রয়েছে নানা নীতিমালা।

❖ ১নং নীতি

ইজমা’ অন্যতম শরয়ী হুজ্জত (প্রমাণ)।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ ومَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى ويَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المؤمِنِينَ نُوَلِّهِ ماتَوَلَّى وَنصْلِهِ جَهنَّمَ وسَاءتْ مَصِيرًا } (النساء : ١١٥)

“*আর যে ব্যক্তি তার নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং বিশ্বাসীদের পথ ভিন্ন অন্য পথ অনুসরণ করবে, তাকে আমি সেদিকেই ফিরিয়ে দেব, যেদিকে সে ফিরে যেতে চায় এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। আর তা কত মন্দ আবাস!*” *(নিসা ঃ ১১৫)*

আর মহানবী (ﷺ) বলেছেন,

(إن أمتي لا تجتمع على ضلالة)

“*নিশ্চয় আমার উম্মত কোন ভ্রষ্টতার উপর একমত হবে না।*” *(আবূ দাউদ ৪২৫৩, তিরমিযী ২ ১৬৭, ইবনে মাজাহ ৩৫৯০নং)*

❖ ২নং নীতি

ইজমা’র জন্য কিতাব ও সুন্নাহ থেকে কোন সূত্র থাকতে হবে। অবশ্য সে সূত্র অনেকের জানা না থাকতে পারে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে ইজমা’ হবে অতিরিক্ত দলীল।

কিয়াস

❖ ১নং নীতি

কিয়াস শরীয়তের একটি দলীল।

একদা মহানবী (ﷺ) বললেন, "(সুতরাহ না হলে) সাবালিকা মেয়ে, গাধা ও কালো কুকুর নামায নষ্ট করে ফেলে।" আবু যার বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল (ﷺ) হলুদ ও লাল কিংবা সাদা না হয়ে কালো কুকুরেই নামায নষ্ট করে তার কারণ কী? বললেন, "কারণ, কালো কুকুর শয়তান।" (মুসলিম ১১৬৫, আবু দাউদ ৭০২ নং প্রমুখ)

লক্ষণীয় যে, আবু যার (رضي الله عنه) সাদা ও হলুদ কুকুরকে কালো কুকুরের উপর কিয়াস করেছেন এবং নবী (ﷺ) তাতে কোন আপত্তি করেননি। মুদলিজী কিয়াস করেছিলেন। যায়দ ও উসামার পায়ের কিয়াসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খোশ হয়েছিলেন। (বুখারী ৩৫৫৫, মুসলিম ৩৬৯ ১নং)

উমার বিন খাত্ত্বাব আবু মূসাকে লেখা চিঠিতে কিয়াস করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (ইসমাঈলী, মুসনাদুল ফারূক ২/৫৪৬)

❖ ২নং নীতি

কিতাব-সুন্নাহ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ থাকতে কিয়াস অচল। যেহেতু তা হল পানি না পেলে তায়াম্মুম করার মতো। বলা বাহুল্য, পানি থাকলে (ব্যবহার সম্ভব হলে) তায়াম্মুম চলে না।

❖ ৩নং নীতি

প্রয়োজন ছাড়া কিয়াস করা যাবে না। যখন কুরআন-সুন্নাহ থেকে কোন স্পষ্ট বিধান অমিল হবে, তখন কিয়াস জায়েয হবে। এ নীতি আগের নীতিরই অনুরূপ।

❖ ৪নং নীতি

যার উপর কিয়াস করা হবে, তা প্রমাণিত হতে হবে।

রসুল (সা.)-এর কর্মাবলি

মহানবী (ﷺ) তার জীবনে দুনিয়া ও আখেরাতের বহু কর্মই করেছেন। সেই সকল কর্ম আমাদের জন্য কখন করণীয় ও কখন নয়, তার জন্য নিম্নোক্ত নীতিমালা জানা আবশ্যক।

❖ ১নং নীতি

দলীল ছাড়া তাঁর বিশেষত্ব প্রমাণিত হবে না।

তিনি যে কাজটি করেছেন, তা কি তার বিশেষত্ব? তার মানে তাঁর উম্মতের করণীয় নয়? এর জন্য দলীল চাই। নচেৎ তাঁর প্রতিটি কর্ম উম্মতের জন্য পালনীয় সুন্নাহ হবে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (الأحزاب :٢١)

"তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" (আহযাব : ২১)

অতএব কোন স্পষ্ট দলীল দ্বারা যখন প্রমাণিত হবে যে, সে কাজ তার জন্য খাস (বিশেষ) ছিল, তাহলে তা আমাদের করণীয় নয়।

❖ ২নং নীতি

যে ইবাদত তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে করেননি, তা আমাদের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে (বাদ না দিয়ে) করে যাওয়া বিধেয় নয়। যেহেতু ইবাদতের মৌলিক নীতি হল, তা নিষেধ; যতক্ষণ না তা দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং যে ইবাদত নবী (ﷺ) একটানা করেননি, তা আমরা করতে পারি না। যেমন জামাআতবদ্ধভাবে নফল নামায পড়া।

আনাস (رضي الله عنه) বলেন, একদা তার নানী খানা বানিয়ে নবী (ﷺ)-কে বাড়িতে দাওয়াত দিয়েছিলেন। তিনি তা খেয়ে বললেন,

(قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ)

"ওঠো, তোমাদের জন্য নামায পড়ি।"

সাহাবীর উক্তি

❖ ১নং নীতি

সাহাবীর উক্তি এক প্রকার দলীল।

সাহাবীর উক্তি শরীয়তের এক প্রকার দলীল। তবে শর্ত হল : তা সহীহ প্রমাণিত হতে হবে; যদিও তা প্রসিদ্ধ না হয়।

কুরআন-হাদীসের উক্তির বিরোধী হবে না।

অন্য কোন সাহাবী তার বিপরীত বলবেন না।

জী! কুরআন ও সুন্নাহর মতো স্বতন্ত্র দলীল নয়। যেমন ইজমা-কিয়াসও তাই।

যেহেতু সাহাবী সর্বশ্রেষ্ঠ শতাব্দীর মানুষ, তিনি ওয়াহী অবতীর্ণ হওয়ার পরিবেশে বাস করেছেন। কাছে থেকে তা শ্রবণ ও উপলব্ধি করেছেন।

তাছাড়া মহানবী খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ইবনে আব্বাসকে কুরআনের ব্যাখ্যা ও দ্বীনের ফিকহ লাভের দুআ দিয়েছেন।

আরো অনেক কারণে তাঁদের উক্তি শরীয়তের এক প্রকার দলীল।

সাহাবী কি ভুলের ঊর্ধ্বে? না, তা নয়। আর তার ভুল প্রমাণিত হলে, তার বিধান আলাদা।

❖ ২নং নীতি

সাহাবীর উক্তি প্রসিদ্ধ ও খ্যাত হলে এবং তার কোন বিরোধী না পাওয়া গেলে তা ইজমা বলে গণ্য হবে।

❖ ৩নং নীতি

সাহাবীদের উক্তি পরস্পরবিরোধী হলে কিতাব ও সুন্নাহর দিকে রুজু

নাসেখ-মনসূখ

পূর্বের বিধান বাতিল করে নতুন বিধান বহাল করাকে 'নস্‌খ' (রহিত করা) বলা হয়। আর পূর্বের বিধানকে 'মনসূখ' (রহিত) এবং পরের বিধানকে 'নাসেখ' (রহিতকারী) বলা হয়।

অবশ্য কোন ব্যাপক বিধানকে নির্দিষ্ট করা এবং অস্পষ্ট বিধানকে স্পষ্ট করাকেও 'নস্‌খ' বলা হয়েথাকে। (আল-মুওয়াফাক্বাত, শাত্বেবী ৩/ ১০৮)

❖ ১নং নীতি

প্রামাণ্য দলীল দ্বারা নস্‌খ সাব্যস্ত হবে; কোন সম্ভাবনাময় উক্তি দ্বারা নয়।

দুটি দলীল পরস্পরবিরোধী হলে হতে পারে একটি নাসেখ ও অপরটি মানসূখ। কিন্তু হতে পারে এই সম্ভাবনা দিয়ে 'নস্‌খ' সাব্যস্ত হবে না।

বলা বাহুল্য, কোন দলীল কোন ইমামের উক্তি বা রায়ের বিরোধী হলে তা মানসূখ ধারণা করা নিঃসন্দেহে অযৌক্তিক।

❖ ২নং নীতি

নস্‌খ কেবল শরীয়তের আহকামের গৌণ বিষয়সমূহে হয়ে থাকে; মুখ্য বিষয়ে নয়। নস্‌খ কোন ঘটনসূচক বা ঐতিহাসিক বিষয় অথবা তওহীদ ও সিফাত সংক্রান্ত বিষয়ে নস্‌খ হয় না। সুতরাং নামায-রোযা প্রভৃতি আহকামে নস্‌খ এসেছে। তওহীদ বিষয়ে নস্‌খ আসেনি। যেমন পূর্ববর্তী জাতির ইতিহাস অথবা ভবিষ্যতের ঘটিতব্য কোন ঘটনা, যেমন মাহদী, ঈসা বা দাজ্জালের আগমন অথবা পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে নস্‌খ আসেনি।

❖ ৩নং নীতি

কিয়াস দ্বারা নস্‌খ সাব্যস্ত হয় না।

মূল হল কিতাব ও সুন্নাহ। কিয়াস হল তার শাখা। সুতরাং শাখা দিয়ে মূলকে রহিত করা যায় না।

পরস্পরবিরোধী দলীলের মাঝে সমন্বয় সাধনের নীতিমালা

❖ ১নং নীতি

কার্যত কিতাব ও সুন্নাহর দলীলসমূহের মাঝে কোন স্ববিরোধিতা নেই। যেটা দেখা যায়, সেটা বাহ্যিক। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ولَو كَانَ مِنْ عِندِ غيرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختِلافًا كَثِيرًا }[النساء : ٨٢]

"এ (কুরআন) যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো তরফ থেকে (অবতীর্ণ) হত, তাহলে নিশ্চয় তারা তাতে অনেক পরস্পর-বিরোধী কথা পেত।" (নিসা : ৮২)

পক্ষান্তরে যদি দুটি দলীলের মাঝে পরস্পরবিরোধিতা স্পষ্ট হয়, তাহলে তা দূরীকরণের জন্য উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে হবে অথবা দুটির মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দিতে হবে। আর বলা যাবে না যে,

(إذا تعارضا تساقطا)

'দুটি পরস্পরবিরোধী হলে (দলীলের যোগ্যতা থেকে) খসে পড়ে।'

কারণ দলীল কখনই খসে পড়ে না, বেকার বা অকেজো হয় না। বরং তা সমন্বয় সাধন বা প্রাধান্য দেওয়ার নীতির সাথে প্রযোজ্য থাকে। কেউ বুঝতে না পারলে সেটা তার অক্ষমতা। তার উচিত তফসীর ও হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং অনুরূপভাবে উলামাদের লেখা উক্ত বিষয় বই-পুস্তক পাঠ করা।

❖ ২নং নীতি

দুটি দলীলের মাঝে সমন্বয় সাধন করার প্রয়োজনীয়তা পড়বে না, যখন উভয়ের একটি সহীহ (প্রামাণ্য) হবে না।

যয়ীফ বা জাল হাদীস সহীহ হাদীসের বিরোধিতার যোগ্য হতে পারে

শরয়ী শব্দার্থ বুঝা অপরিহার্য

কুরআন ও সুন্নাহর শব্দ ও বাক্যের সঠিক উদ্দেশ্য বুঝতে হবে তালেবে ইল্‌মকে। সুতরাং এ মর্মে নীতি স্মরণে রাখতে হবে।

❖ ১নং নীতি

কিতাব ও সুন্নাহর শব্দাবলীকে শরয়ী প্রকৃতার্থে অনুধাবন করতে হবে।

যেহেতু একই শব্দের আভিধানিক অর্থ থাকে। যেমন তার পারিভাষিক ও রূপক অর্থ থাকে। কিন্তু প্রাথমিকভাবেই শব্দকে শরয়ী পরিভাষায় তার প্রকৃতার্থে অনুধাবন করতে হবে।

যেমন 'উযূ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, দুই হাত ধোয়া। কিন্তু শরয়ী পরিভাষায় তার অর্থ হল যথানিয়মে নির্দিষ্ট অঙ্গরাজি প্রক্ষালন ও স্পর্শ করে উযূ করা। অতএব উযুর আসল অর্থ হবে শরয়ী পরিভাষার উযূ।

বলা বাহুল্য, কুরআন-হাদীসের পরিভাষাকে ভাষাবিদ বা অন্য কোন নীতিবিদ বা মতবাদীদের পরিভাষার উপর প্রাধান্য দিতে হবে।

❖ ২নং নীতি

কুরআন-সুন্নাহতে যে 'নাফি' (না-সূচক) খন্ডনমূলক বাক্য থাকে, তার অর্থ পরিপূর্ণতা বা পূর্ণাঙ্গতার খন্ডন। কিন্তু সে পূর্ণাঙ্গতার উদ্দেশ্য মুস্তাহাব নয়; বরং ওয়াজেব।

যেমন নবী (ﷺ) এক ব্যক্তির নামায পড়া দেখে বললেন, 'তুমি নামায পড়লে না। ফিরে গিয়ে পুনরায় পড়।"

তার মানে, তোমার নামায হল না। নামায পরিপূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ হল না। এই পরিপূর্ণতায় যেটা কমতি ছিল, সেটা মুস্তাহাব নয়, বরং ওয়াজেব।

কুরআন-সুন্নাহর বাক্যে এমনটাই বুঝতে হবে।

শরীয়তের হুকুম, আদেশ-নির্দেশসূচক বাক্য

❖ ১নং নীতি

আদেশসূচক বাক্য মূলতঃ অবশ্যপালনীয়। শরীয়তের বিধানে যার মান ওয়াজেব।

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فليحْذَرِ الذينَ يُخالِفُونِ عِنْ أمْرِهِ أنْ تُصِيبَهُم فِتنِةٌ أوْ يُصِيبَهُم عَذابٌ ألِيمٌ} النور ٦٣

"সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।" (নূর : ৬৩)

এখানে আদেশ পালন যদি ওয়াজেব (আবশ্যক) না হতো, তাহলে তা উপেক্ষা করাতে বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তির হুমকি থাকত না। যেমন মহানবী (ﷺ) বলেছেন,

(لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي - أَوْ عَلَى النَّاسِ - لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ).

"যদি আমি আমার উম্মতের উপর বা লোকেদের উপর কঠিন মনে না করতাম, তাহলে প্রতিটি নামাযের সাথে দাঁতন করার আদেশ দিতাম।" (বুখারী ৮৮৭, মুসলিম ৬১২নং)

আর তারই অর্থ রয়েছে অন্য এক বর্ণনায়,

«لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ مَعَ الْوُضُوءِ».

"আমি আমার উম্মতের পক্ষে কষ্টকর না জানলে (প্রত্যেক) ওযুর সাথে দাতন করা ফরয করতাম।" (হাকেম ৫১৬, বাইহাকী ১৪৬, সহীহুল জামে' ৫৩১৯নং)

বোঝা গেল যে, তার আদেশ পালন করা ফরয বা ওয়াজেব। আর তা পালন করা কষ্ট বলেই তিনি আদেশ বা ফরয করেননি।

নিষেধ

❖ ১নং নীতি

কোন কিছু নিষেধ, মানা বা বারণ মানেই, তা হারাম।

অবশ্য কোন পার্শ্ব-সংকেত থাকলে তার অর্থ মাকরূহও হতে পারে।

মহানবী (ﷺ) বলেছেন,

(دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ واخْتِلافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ).

"আমি যে ব্যাপারে তোমাদেরকে (বর্ণনা না দিয়ে) ছেড়ে দিয়েছি, সে ব্যাপারে তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও (অর্থাৎ, সে ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করো না)। কারণ, তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের অধিক প্রশ্ন করার এবং তাদের নবীদের সঙ্গে মতভেদ করার ফলে ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং আমি যখন তোমাদেরকে কোন জিনিস থেকে নিষেধ করব, তখন তোমরা তা হতে দূরে থাকবে। আর যখন আমি তোমাদেরকে কোন কাজের আদেশ দেব, তখন তোমরা তা সাধ্যমতো পালন করবে।" (বুখারী ৭২৮৮, মুসলিম ৩৩২১নং)

বলা বাহুল্য, মূলতঃ নিষেধ হল 'মকরূহে তাহরীমী' বা হারামের অর্থে। অন্য দলীল দ্বারা সে অর্থ থেকে 'মকরূহে তানযীহী'র অর্থও হতে পারে।

জ্ঞাতব্য যে, অধিকাংশ উলামার রায়ে কোন হারাম মকরূহে পরিণত হবে না; যতক্ষণ না ইজমা হয়েছে। যেমন ইবাদতের ক্ষেত্রে নিষেধের অর্থ হারাম এবং আদব ও শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে তা মাকরূহ, এমন কথার কোন দলীল নেই।

❖ ২নং নীতি

যা নিষিদ্ধ, তা করলে, তা অশুদ্ধ ও বাতিল।

ইহরাম অবস্থায় বিবাহবন্ধন নিষেধ। কেউ করলে তা বাতিল। উমার বিন

আম-খাস

❖ ১নং নীতি

খাসের দলীল পাওয়া গেলে আমকে খাস করা যায়। কিন্তু আমের কিছু অংশের উল্লেখ-সহ কোন খাসের দলীল পাওয়া গেলে উল্লিখিত অংশ দ্বারা আম উক্তিকে কোন পার্শ্ব-সংকেত ছাড়া খাস করা যায় না।

উদাহরণ স্বরূপ :

(لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ ، وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ) .

আয়েশা (رضي الله عنها) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি। যে, "খাবার হাযির থাকা কালীন অবস্থায় নামায নেই, আর পেশাব পায়খানার চাপ সামাল দেওয়া অবস্থায়ও নামায নেই।" (মুসলিম ১২৭৪নং)

উক্ত হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, আমভাবে যে কোন খাবার হাযির থাকলে তা রেখে নামায শুদ্ধ নয়। চাহে সে খাবার দুপুরের হোক অথবা রাতের।

কিন্তু ইবনে উমার (رضي الله عنه)-এর হাদীসে বলা হয়েছে,

« إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ».

"যখন তোমাদের কারো রাতের খাবার রাখা হবে এবং নামাযের ইকামত হয়ে যাবে, তখন রাতের খাবার আগে খাও।" (বুখারী ৬৭৩, মুসলিম ১২৭২নং)

উক্ত হাদীসে রাতের খাবারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে আয়েশার হাদীসে উল্লিখিত 'খাবার' মানে কি 'রাতের খাবার'?

আসলে তা নয়। সুতরাং সাহাবাগণের আমল ছিল আম খাবারের উপর।

তদনুরূপ হাদীসে আমভাবে এসেছে, "যে কোনও চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা হবে, পবিত্র হয়ে যাবে।" (তিরমিযী ১৭২৮, ইবনে মাজাহ ৩৬০৯নং)

ভাবার্থ

অনেক সময় দলীলের শব্দে নির্দিষ্ট বিষয়ের বিধান স্পষ্ট থাকে না। কিন্তু তার ভাবার্থে সে কথা স্পষ্ট বোঝা যায়।

❖ ১নং নীতি

যে ভাবার্থ শব্দের বা বাক্যের অনুকুল, তা এক প্রকার দলীল।

শরীয়তের দলীলে অনেক সময় এমন শব্দ আসে, যার ভাবার্থে এমন কিছুর বিধান বুঝা যায়, যার জন্য কোন শব্দ উল্লিখিত নেই। তার বিধান হয়, তারই অনুরূপ অথবা তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

যেমন মহান আল্লাহ স্পষ্ট বলেছেন, 'তোমরা পিতামাতাকে উঃ বলো না।' (ইসরা' ঃ ২৩)

এই শব্দাবলীতে তাদেরকে মারধর করতে নিষেধ করা হয়নি। কিন্তু এর ভাবার্থ আমাদেরকে সূচিত করে যে, তা অধিকভাবে নিষিদ্ধ।

'তোমরা দারিদ্র-ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না।" (আনআম : ১৫১, ইসরা' : ৩১)

অনুকূল ভাবার্থে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, দারিদ্র্যের ভয় না থাকলে হত্যার নিষেধ আরো কঠোর।

❖ ২নং নীতি

বিপরীতধর্মী ভাবার্থও এক প্রকার দলীল।

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الذينَ كَفَرُوا} [النساء: ١٠١]

"তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে, তখন যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, অবিশ্বাসিগণ তোমাদেরকে বিপন্ন করবে, তাহলে নামায কসর (সংক্ষিপ্ত) করলে তোমাদের কোন দোষ নেই।" (নিসা : ১০১)

শরয়ী বিধানসমূহের পাঁচটি মান

শরীয়তের পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি করণীয়-বর্জনীয় বিধান পালনের যে নির্দেশ থাকে তা পালনের আবশ্যকতা বা অনাবশ্যকতার ব্যাপারে ৫টি মান রয়েছে।

(১) ফরয বা ওয়াজেব : যা পালন করা জরুরী বা আবশ্যক, না করলে মহাপাপ হয়।

(২) সুন্নত বা মুস্তাহাব : যা পালন করা উচিত, উত্তম বা ভালো, করলে সওয়াব হয় এবং না করলে গোনাহ হয় না।

(৩) মুবাহ, জায়েয বা বৈধ : যা করা বা না করায় কোন পাপ-পুণ্য নেই।

(৪) মাকরূহ বা অপছন্দনীয় : যা করা অনুচিত, ঘৃণ্য বা অপছন্দনীয়, না করলে সওয়াব হয় এবং করলে গোনাহ হয় না।

(৫) হারাম, নাজায়েয বা অবৈধ : যা না করা জরুরী বা আবশ্যক, করলে মহাপাপ হয়।

উক্ত পাঁচটি শরয়ী বিধানের মান নিয়ে বিস্তারিত মৌলনীতি নিম্নরূপ :

ওয়াজেব

❖ ১নং নীতি

ওয়াজেব ও ফরযের মাঝে মানগত কোন পার্থক্য নেই।

অনেকে বলে থাকেন, সন্দিগ্ধ দলীল (যেমন খবরে ওয়াহিদ বা একক বর্ণনাকারীর হাদীস) দ্বারা প্রমাণিত বিষয়কে ওয়াজেব এবং অকাট্য দলীল (যেমন কুরআন ও মুতাওয়াতির হাদীস) দ্বারা প্রমাণিত বিষয়কে ফরয বলা হয়।

সালফদের নিকট এমন পার্থক্য ছিল না। যেহেতু তাঁদের নিকট দলীল গ্রহণে খবরে ওয়াহিদ ও মুতাওয়াতিরের মাঝে কোন পার্থক্য ছিল না।

❖ ২নং নীতি

যে ওয়াজেবের সময় নির্ধারিত নয়, তা সত্বর সম্পাদন করা ওয়াজেব।

যেহেতু কেউ জানে না যে, পরবর্তী সময়ে তার কী ঘটবে?

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُم}[آل عمران : ١٣٣]

তোমরা প্রতিযোগিতা (ত্বরা) কর, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমার জন্য---। (আলে ইমরান : ১৩৩)

❖ ৩নং নীতি

যে ওয়াজেব পুরোটা পালন করার সামর্থ্য নেই, সে ওয়াজেব যথাসাধ্য যতটা পারা যায়, ততটাই পালন করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا] {التغابن:١٦}

“তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর এবং শোনো, আনুগত্য কর।” (তাগাবুনঃ ১৬)।

আর মহানবী (ﷺ) বলেছেন,

মুস্তাহাব, মানদুব বা সুন্নত

❖ ১নং নীতি

কোনটা ওয়াজেব, কোনটা সুন্নত, তা জানা ওয়াজেব আলাল কিফায়াহ।

অর্থাৎ, কিছু লোক জানলে বাকী লোক অপরাধী হয় না। অনুরূপভাবে পঞ্চবিধানের বাকিগুলির ক্ষেত্রেও বলা যায়।

❖ ২নং নীতি

মুস্তাহাব বা সুন্নত আমল শুরু করলে তা শেষ করা ওয়াজেব হয়ে যায় না।

যেহেতু যা শুরু করা ওয়াজেব নয়, তা শেষ করা ওয়াজেব হয় না।

যেমন সুন্নত নামায বা রোযা শুরু করলে এবং কোন কারণে তা ভাঙ্গতে হলে গোনাহ হয় না।

অবশ্য এ ক্ষেত্রে হজ্জ-উমরাহর বিষয়টা স্বতন্ত্র। কেননা মহান আল্লাহর স্পষ্ট নির্দেশ,

{وأتمُّوا الحَجَّ والعمْرَةَ للهِ} [البقرة: ١٩٦]

"আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরাহ পূর্ণভাবে সম্পাদন কর।" (বাক্বারাহ : ১৯৬)

কিন্তু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ولاتَبطِلُوا أعْمَالَكُم}[محمد: ٣٣]

"তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বাতিল করো না।" (মুহাম্মাদ : ৩৩)

তাঁর এই আম নির্দেশ থেকে বুঝা যায় যে, কোন আমলই বাতিল বা নষ্ট করা যাবে না।

তবে অধিকাংশ উলামাগণ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'রিয়া (লোকপ্রদর্শন) দ্বারা তোমরা তোমাদের আমল বরবাদ করো না। বরং তা বিশুদ্ধভাবে

মুবাহ

যা করলেও সওয়াব বা গোনাহ নেই, ছাড়লেও সওয়াব বা গোনাহ নেই।

❖ ১নং নীতি

ব্যবহারিক বিষয়-বস্তুসমূহের মৌলিক বিধান হল, তা মুবাহ।

হারাম বলতে হলে, তার দলীল চাই। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ] {الأنعام:١١٩}

“যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বিবৃত করেছেন।” (আনআম : ১১৯)

নিষিদ্ধ ও হারাম বস্তু তিনি বিবৃত করেছেন, অর্থাৎ তিনি বিশদভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং বিশদে যার হারাম হওয়ার কথা আসেনি, তা হারাম নয়। আর যা হারাম নয়, তা হালাল। (মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ২১/৫৩৬)

মহানবী (ﷺ) বলেছেন,

« الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِى الْقُرْآنِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِى الْقُرْآنِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَقَدْ عَفَا عَنْهُ ».

“হালাল তাই, যা আল্লাহ কুরআনে হালাল করেছেন এবং হারাম তাই, যা আল্লাহ কুরআনে হারাম করেছেন। আর যে বিষয়ে নীরব থেকেছেন, সে বিষয় ক্ষমাই করেছেন।” (তিরমিযী ১৭২৬, ইবনে মাজাহ ৩৩৬৭নং)

অর্থাৎ, যে বিষয়-বস্তুকে তিনি ‘হারাম’ বলে ঘোষণা করেননি, তা হল হালাল। তা গ্রহণ করলে ক্ষমার্হ হবে, তাতে কোন শাস্তি হবে না।

শরীয়তের কিছু পরিভাষা আছে, যার মাধ্যমে মুবাহ বা হালাল হওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার হয়। যেমন :

- কোন বিষয়ে অনুমতি বা অনুমোদন দেওয়া।

বলাই বাহুল্য যে, পানাহার, নিদ্রা, অর্থোপার্জন ইত্যাদি বিষয় মুবাহ হলেও, তাতে যদি কোন ইবাদত বা আনুগত্যে শক্তি-অর্জন উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সেসব মুবাহ কাজও ইবাদতে পরিণত হয়। (গামযু উয়ূনিল বাস্বায়ির ৩৪৮পৃঃ)

মাকরূহ

প্রথমত: ফিকহী পরিভাষায় মাকরূহ

মাকরূহ হল প্রত্যেক সেই নিষিদ্ধ জিনিস, যাকে শরীয়ত কঠোর বা চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেনি।

মাকরূহ হল মুবাহ ও হারামের মাঝামাঝি মানের বিধান। যা করলে গোনাহ হয় না এবং না করলে সওয়াব পাওয়া যায়।

এমন কাজ করতে নিষেধ আসে, কিন্তু অন্য দলীল দ্বারা বোঝা যায় যে, সে নিষেধ থেকে উদ্দিষ্ট 'হারাম' পর্যায়ের নিষেধ নয়।

যেমন উম্মে আত্বিয়্যাহ (رضي الله عنها) বলেন, 'আমাদেরকে জানাযার সাথে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু (এ ব্যাপারে) আমাদের উপর জোর দেওয়া হয়নি।' (বুখারী ১২৭৮, মুসলিম ২২০৯-২২১০নং)

অর্থাৎ, যেমন অন্যান্য হারাম কাজ কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে, তেমন কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়নি।

তার মানে হল, আমাদের জন্য জানাযায় অংশগ্রহণ করা মাকরূহ করা হয়েছে, হারাম করা হয়নি।

দ্বিতীয়ত: শরীয়তের পরিভাষায় মাকরূহ

শরীয়তের পরিভাষায় মাকরূহ অর্থ ঘৃণ্য ও হারাম। যেমন শির্ক করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, অপব্যয় করা, কার্পণ্য করা, একেবারে মুক্তহস্ত হওয়া, সন্তান হত্যা করা, ব্যভিচার করা, মানুষ খুন করা, এতীমের সম্পত্তি

হারাম

❖ ১নং নীতি

সকল হারাম এক পর্যায়ের নয়।

কোন কোন হারাম বিষয় অন্য হারাম থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি বড়। যেমন সূদ খাওয়া ও খুন করা। অবশ্যই খুন করা বেশি মাপের হারাম। আর এ পার্থক্য হারামের ক্ষতিকারিতা ও শাস্তি দেখে নির্ধারণ করা যায়।

❖ ২নং নীতি

কোন জিনিস হারাম হলে, তার সকল অংশই হারাম।

যেমন শূকর, কুকুর, মৃত পশুর সকল অংশই হারাম।

অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী বয়ান পাওয়া গেলে সে কথা আলাদা। যেমন পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহার করার বিষয়। প্রক্রিয়াজাত করে চর্মের ব্যবহার ইত্যাদি।

❖ ৩নং নীতি

হারামের অসীলাও হারাম। যে হালাল কাজ হারাম কাজে পৌঁছে দেয়, তা হারাম। যে হালাল কাজের কারণে কোন হারাম সৃষ্টি হয়, তা করা হারাম।

তাহাজ্জুদ পড়তে গিয়ে যদি কারো ফজর ছুটে যায়, তাহলে তার জন্য তাহাজ্জুদ পড়া জায়েয নয়।

যদি কাউকে একাকী ছাড়লে হারাম ঘটবে ধারণা হয়, তাহলে তাকে একাকী ছাড়া বৈধ নয়।

পাপ করা যেমন হারাম, তেমনি তার ছিদ্রপথ বা মাধ্যম বন্ধ করা ওয়াজেব।

মুসলিম নর-নারীর ক্ষেত্রে কতিপয় মৌলনীতি

❖ ১নং নীতি

মুসলিম শরয়ী ভারপ্রাপ্ত হয় সাবালক-সাবালিকা হলে।

সাবালক হওয়ার চিহ্ন হল :

১. স্বপ্নদোষ শুরু হওয়া।

২. লজ্জাস্থানের লোম পুরু হয়ে গজিয়ে ওঠা।

৩. অথবা ১৫ বছর বয়স হওয়া।

সাবালিকা হওয়ার চিহ্ন হল :

১. স্বপ্নদোষ শুরু হওয়া।

২. লজ্জাস্থানের লোম পুরু হয়ে গজিয়ে ওঠা।

৩. মাসিক শুরু হওয়া।

৪. অথবা ১৫ বছর বয়স হওয়া।

❖ ২নং নীতি

ভারপ্রাপ্ত গণ্য হবে দুটি শর্তে ঃ সজ্ঞানতা ও সক্ষমতা।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ لايُكَلِّفُ الله نَفْسًا إلا وُسْعهَا } [البقرة : ٢٨٦]

"আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না।" *(বাক্বারাহ : ২৮৬)*

{ ومَا كُنَّا مُعذِّبِينَ حتَّى نبْعَثَ رَسُولاً } [الإسراء : ١٥]

"আমি রসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দিই না।" *(বানী ইস্রাঈল : ১৫)*

বলা বাহুল্য, ইলম ও আমলে সামর্থ্য না থাকলে মুসলিম শরয়ী ভারপ্রাপ্ত হয় না।

ইজতিহাদ ও তাক্বলীদ

সরাসরি দলীল দেখে ও বুঝে বিধান গ্রহণ করার নাম ইজতিহাদ। যিনি তা করতে পারেন, তিনি হলেন মুজতাহিদ। আর যিনি তা পারেন না; বরং বিনা দলীলে অপরের অন্ধানুকরণ করেন, তিনি হলেন মুক্বাল্লিদ এবং তাঁর এই কর্মের নাম তাক্বলীদ। অবশ্য যিনি দলীল দেখে কারো অনুসরণ করেন, তাঁর কর্ম হল ইত্তিবা'।

এ মর্মেও রয়েছে একাধিক নীতি।

❖ ১নং নীতি

যাঁর কাছে দলীল পৌঁছেছে অথবা যিনি দলীল খুঁজতে সক্ষম, তাঁর জন্য বিধেয় নয়, দলীল উপেক্ষা করে কোন বড় বা ছোট আলেমের অন্ধানুকরণ বা তাক্বলীদ করা।

মূলতঃ তাক্বলীদ বৈধ নয়। প্রত্যেক সক্ষম মুসলিমের উচিত দলীল অনুসন্ধান করা এবং কারো কথাকে সেইরূপ মেনে না নেওয়া, যেরূপ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথাকে মেনে নেওয়া হয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

(اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ) (الأعراف : ٣)

"তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে অনুসরণ করো না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।" (আরাফ : ৩)

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء : ٥٩)

"হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তাহলে

বিবিধ ফিকহী নীতিমালা

❖ ১নং নীতি

إنما الأعمال بالنيات، الأمور بمقاصدها.

প্রত্যেক বিষয় উদ্দেশ্যের সাথে জড়িত।

প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

চুক্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রে অর্থ ও উদ্দেশ্য বিবেচ্য, কেবল শব্দ ও বাক্য নয়।

উদাহরণ স্বরূপ, কেউ একজনকে কিছু টাকা দিল। সেই টাকা দাতার নিয়ত বা উদ্দেশ্য অনুযায়ী দান বা উপহার হতে পারে, হতে পারে পরিশোধযোগ্য ঋণ, হতে পারে ফেরৎযোগ্য আমানত।

অনুরূপ ঘটে থাকে কসম, নযর, তালাক প্রভৃতি মাসায়েলে।

নিয়তের ভিত্তিতেই একটা কাজই শির্ক, বিদআত, ওয়াজেব, মুস্তাহাব, মুবাহ মাকরূহ বা হারাম হতে পারে।

মহানবী (ﷺ) বলেছেন,

(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ).

"যাবতীয় কার্য নিয়ত বা সংকল্পের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষের জন্য তাই প্রাপ্য হবে, যার সে নিয়ত করবে। অতএব যে ব্যক্তির হিজরত (স্বদেশত্যাগ) আল্লাহর (সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে ও তাঁর রসূলের জন্য হবে; তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যই হবে। আর যে ব্যক্তির হিজরত পার্থিব সম্পদ অর্জন কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যেই হবে, তার হিজরত যে সংকল্প নিয়ে করবে তারই জন্য হবে।" *(বুখারী ১নং, মুসলিম ১৯০৭নং)*

নিয়তের ফলেই একটি ক্ষুদ্র কাজ মহান রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করে এবং

বিদআতের নীতিমালা

দ্বীনের মধ্যে উদ্ভাবিত বিষয়, যা দ্বীন নয়, তাকে বিনা কোন দলীলে দ্বীন বলে পালন করা কর্মই হল বিদআত। এ বিষয়ে রয়েছে অনেক নীতিমালা।

❖ ১নং নীতি

মূলতঃ ইবাদত নিষিদ্ধ, যতক্ষণ না তা বিধিবদ্ধ হওয়ার দলীল পাওয়া যাবে। যেমন পার্থিব চালচলন মূলতঃ বৈধ, যতক্ষণ না তা নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল পাওয়া যাবে।

মহানবী (ﷺ) বলেছেন,

((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ،

وفي رواية لمسلم : ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيهِ أمرُنا فَهُوَ رَدٌّ)).

"যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনে (নিজের পক্ষ থেকে) কোন নতুন কথা উদ্ভাবন করল...যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।" (বুখারী ২৬৯৭, মুসলিম ৪৫৮৯নং)

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি এমন কাজ করল, যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ নেই, তা বর্জনীয়।" (৪৫৯০ নং)

❖ ২নং নীতি

শরীয়তে বিদআতে হাসানাহ (ভালো বিদআত) ও বিদআতে সাইয়িআহ (খারাপ বিদআত) বলে কিছু নেই; বরং সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা।

মহানবী (ﷺ) বলেছেন,

(وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اختِلافاً كَثيراً ، فَعَلَيْكُمْ بسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بالنَّواجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ ؛ فإنَّ كلَّ بدعة ضلالة).

"(স্মরণ রাখ) তোমাদের মধ্যে যে আমার পর জীবিত থাকবে, সে অনেক

যে প্রক্রিয়াতে হাদীসকে সহীহ-যয়ীফ নির্ধারণ সঠিক নয়

প্রথমত: যে প্রক্রিয়াতে হাদীসকে সহীহ বলা যায় না।

সহীহ হাদীস তাকে বলে, যার মধ্যে ৫টি শর্ত বর্তমান থাকে :

১. সনদ বা সূত্র অবিচ্ছিন্ন থাকা। প্রত্যেক বর্ণনাকারীর ঊর্ধ্বতন বর্ণনাকারী থেকে স্বকর্ণে হাদীস শোনা প্রমাণিত হওয়া।

২. বর্ণনাকারীদের সৎ, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হওয়া।

৩. তাঁদের স্মৃতিশক্তি তথা নির্ভুল বর্ণনা-ক্ষমতা বিদ্যমান থাকা।

৪. হাদীসটি তুলনামূলক অধিকতর সহীহ হাদীসের বিরোধী প্রমাণিত না হওয়া।

৫. যে কোনও সূক্ষ্ম দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া।

সুতরাং উক্ত ৫টি শর্তের মধ্যে যে কোনও একটি অবর্তমান থাকলে হাদীস 'যয়ীফ' বলে সাব্যস্ত হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, হাদীসকে 'সহীহ' সাব্যস্ত করার মানসে এ ছাড়া আরো কিছু প্রক্রিয়া প্রয়োগ হয়ে থাকে, যা আদৌ শুদ্ধ নয়। যেমন–

❖ ১নং প্রক্রিয়া

হাদীসের অর্থ সহীহ, তাই হাদীস সহীহ।

এমন অনেক হাদীস আছে, যা যে কোন কারণে যয়ীফ। কিন্তু তার অর্থ সহীহ। কিন্তু তা রাসুলল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি সম্পৃক্ত করা সঠিক নয়। যেহেতু প্রত্যেক সেই কথা, যার অর্থ সহীহ, সেটাই তিনি বলেছেন, তা নয়।

❖ ২নং প্রক্রিয়া

অভিজ্ঞতা দ্বারা হাদীসকে সহীহ ধারণা করা।

কোন একটি যয়ীফ হাদীসের দুআ কবুল হয়েছে, বিধায় হাদীসটি সহীহ, তা নয়।